উড়োফোন

আবেশ কুমার দাস

ক্রিং ক্রিং ক্রিং

সদ্যস্নাত শরীরের ওপর ভিজে গামছাখানাকে আলতোভাবে জড়িয়ে যখন স্নানঘরের একটুকরো নিভৃত পরিসর ছেড়ে সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুমটায় পা রাখল তিথি তখনই ফোনের বাজনাটা থেমে গেল। শেষের দিকটা শুধু কানে গিয়েছিল তার। ফোনটা ধরার আর ফুরসৎ পাওয়া গেল না।

তিথির ফোনে কলার আই ডি নেই। কাজেই কে ফোন করেছিল জানারও কোনো উপায় নেই।

কতক্ষণ বেজেছিল কে জানে।

যাকগে, যদি তিথিকে ফোন করার কারো জরুরি দরকার থাকে তাহলে সে আবার ফোন করবে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হয়তো। গামছাটা ছেড়ে ম্যাক্সিটা পরতে থাকে সে। ফোন করার মধ্যে আছে এক স্বপনদা, সাধন, অনিমেষদের গ্রুপটার কেউ, কলেজের কেউ, আর নয়তো বাড়ি থেকে বাবা অথব মা। বড়জোর ব্যারাকপুরের ছোড়দি।

ড্রেসিং টেবিলের সাথে অ্যাটাচড্ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে হয়। এমনও তো হতে পারে, যে ফোন করেছিল সে একবার নয় পরপর বার তিন চারেক রিং করেছিল। শেষবারের বাজনাটুকুই শোনার সুযোগ হয়েছে তার। কানে যায়নি। সে তখন হয়তো স্নানঘরের শীতল নিমগ্নতায় বুঁদ হয়েছিল। তাহলে পর পর তিন চারবারের চেষ্টাতেও তাকে না পেয়ে হয়তো যে ফোন করেছিল সে ধরে নিয়েছে যে তিথি ফ্ল্যাটে নেই এখন। আর ফোন করে লাভ নেই।

হ্যাঁ, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা আছে বটে ষোল আনা।

নাঃ, এবার একটা কলার আইডি লাগাতেই হবে। শুধু শুধু কিপ্টেমো ক'রে লাভ নেই। এত টাকা এত দিকে যাচ্ছে যখন এমনিই। কলার আইডিটা আরো আগেই নেওয়া উচিত ছিল। ওই বস্তুটার প্রয়োজন তার আরো বেশি। একা একা থাকে উত্তর কলকাতার এই দু'কামরার ফ্ল্যাটে। হয়তো যখন সে বাথরুমে গেছে তখন কোনোদিন কেউ এভাবে তাকে ফোনে বারবার ধরার চেষ্টা ক'রে পেল না। তিথি তো জানতে পারবে না সে কথা। ঘরে অন্য কেউ থাকলে আলাদা কথা। কিন্তু সেই 'অন্য' কারোর পাটটাই তো চুকে গেছে তার জীবন থেকে।

আবার ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

ফোন নয়। এবারে কলিং বেল। একটা বাজে। হোম সার্ভিস থেকে খাবার নিয়ে এসেছে নিশ্চয়।

দরজা খুলে তিথি দেখে হ্যাঁ তাই।

এদের বেশ সময়জ্ঞান আছে। রবিবার কোনো আলসেমি নেই।

দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেই স্নানঘরের ভেতরটা এক অন্য পৃথিবী। বন্ধ দরজার এপাশে নিভৃত জগৎটায় বহির্বিশ্বের কোনো হট্টগোল বা কোলাহলই এসে পৌঁছতে পারে না। শুধুই একটানা মৃদুতানে শাওয়ারের ঝিরঝিরে নিরুত্তাপ অনুরণন। স্নানঘরের এই নিস্তব্ধ জগৎটায় এসে ঢুকলে তিথির মনে হয় আর কখনও যেন বাইরের পৃথিবীটার কেউ তার ঠিকানা খুঁজে পাবে না। প্রতিদিনের চেনা পৃথিবীটার শত শহস্র চেতনা অচেনা মানুষের দৈনন্দিন জীবনস্রোত থেকে সে যেন অনেক অনেক দূরে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তার এই নিভৃত পৃথিবীটায় কেবল একটাই শব্দ—শাওয়ারের ওই মৃদু একটানা আওয়াজটুকু।

অন্য কেউ শুনলে হয়তো হাসবে, তার দু'কামরার ফ্ল্যাটের এই স্নানঘরটাই তিথির সবথেকে প্রিয়। স্নানঘরের এই নিভৃতির মাঝে ঝিরঝির জলপ্রবাহের মৃদু তালের সাথে সঙ্গতি রেখেই যেন নিত্যনতুন গল্পের প্লটের ধারা দেয় তার ভাবনায়।

তিথি ঘোষদস্তিদার। বছর পঁয়ত্রিরিশের নারীবাদী লেখিকা। বিবাহবিচ্ছিন্ন, উত্তর কলকাতার এই দু'কামরার ফ্ল্যাটে একাবাসিনী। লেখাটা তার অনেকদিনের নেশা। পেশা কলকাতারই এক উমেনস্ কলেজে অধ্যাপানা।

প্রদীপের সাথে ডিভোর্সের মাসখানেকের মধ্যে এই চাকরিটা জুটে গিয়েছিল ভাগ্যিস। নয়তো আবার বাবা মায়ের সংসারেই ফিরে যেতে হত তাকে। সেই সংসারও তো আর এখন বাবা মার হাতে নেই। দাদা বৌদির কব্জায় চলে গেছে। ডিভোর্সের পরে দাদার সংসারে ফিরে যাওয়ার যে কী যন্ত্রণা তা বৌদির কয়েকটা ব্যবহারেই টের পেয়ে গিয়েছিল তিথি। বুঝতে থাকেনি যত দিন যাবে সবকিছু আরো প্রকট হয়ে উঠতে থাকবে। সেই সময়ই বরাতজোরে এই চাকরিটা জুটে গিয়েছিল। একই সাথে রথ দেখা কলা বেচার মতো ব্যাপার হয়েছিল তাতে। হুগলি থেকে একটা মেয়ের পক্ষে এতটা পথ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা সম্ভব ছিল না। তাই শোভাবাজারে উঠে আসা। দাদা বৌদির সংসারেও থাকতে হল না। ওদিকে স্বনির্ভরতার ভরসাটুকুও মিলল। যে জীবনটাকে পিছনে ফেলে এসেছে তিথি সেটাকে সে ভুলেই থাকতে চায়। আর তাই সেই জীবনের আগাপাশচলার যে সম্পর্কের বাঁধনগুলো গিঁট ধরে ছিল সেগুলোকেও আর সে নিজের সঙ্গে খুব বেশি ক'রে জড়িয়ে রাখতে চায়নি। তার এই মনোভাবটা হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে একটু বেশি ক'রেই প্রকট হয়ে উঠছিল। উপায়ান্তর ছিল না। সহানুভূতির ছলে ঠোকা দেওয়ার লোকের অভাব হয় না সংসারে। তাই কোথাও কোথাও একটু বেশিই রূঢ় হয়ে উঠতে হয়েছিল। আজকাল আত্মীয়স্বজনেরাও বুঝে নিয়েছে তার চাহিদাটা। তাই তাকে মাসে অন্তত একটা ফোন করার মানুষও আজকাল কমে গেছে। ওবেলার ফোনটা কে করেছিল ভেবে পায় না তিথি। পরে আর কোনো ফোন আসেনি। শয়তানি ক'রে কেউ মিসকল দিয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু তাও তার মনটা খুঁতখুঁত করে। একেবারে অচেনা অজানা নম্বরে কি কেউ মিসকল দেয়!

তিথির মনে পড়ে পুরনো এক বন্ধু সৌগতর কথা। সৌগতর ছিল এই দোষ। করার কিছু না থাকলে বাড়ির ল্যান্ডফোন থেকে ও মিসকল দিতে অচেনা অজানা নম্বরে। হিজিবিজি যা নম্বর মনে আসত ডায়ল ক'রে যেত। এমন করতে করতে যখন উৎসাহটা ওর একটু বেশি হয়ে গেল তখন একটু বেশিক্ষণ ধরে রিং করতে লাগল। তাতে ক'রে দু'চারবার কলও উঠে যেত। শেষটায় একমাসে আটশো টাকার মতো বিল আসার পর ওর উৎসাহটা মিটেছিল।

ভাবতে ভাবতে তিথির হঠাৎ মনে হল এই যে একটা উড়োফোন—একে কেন্দ্র ক'রে বেশ জমজমাট অর্থাৎ নারীবাদী ভাবনা— তার রং-ও লাগালেন যায় এই গল্পে।

স্বামী স্ত্রী দুজনের ছোট্ট ছিমছাম সংসার। সংসারের নারীটির চোখে অনাগত রঙিন স্বপ্নের আকাশকুসুম। অবশ্যই সেই স্বপ্নের কেন্দ্রে তার ভালোবাসার মানুষ স্বামীটি। যার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্নে সে একদিন ঘর ছেড়েছিল।

এই আপাত সুখের সাজানো সংসারেই একদিন অশান্তির উড়োমেঘ ঘনায়। সমস্ত কিছুর মূল একটা উড়োফোন। নিছক একটা উড়োফোন। এক রবিবার যখন স্বামীটি বাড়িতে উপস্থিত আর চা জলখাবারের সাথে চলেছে দুজনের হালকা চালের রসালাপ, ঠিক তখনি ঘরের এককোণে রাখা দুরভাষ যন্ত্রটি বেজে ওঠে।

হয়তো ও প্রান্তে ছিল সৌগতর মতো কেউ যার কাছে এ ছিল নেহাতই সময় কাটানোর খেলা। খানিকক্ষণ ধরে বেজে চলে যন্ত্রটি। স্বামীটি উঠে গিয়ে হ্যালো বলার সাথে সাথেই ওপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সংযোগ।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু পরিণতিটা আর সামান্য থাকে না। স্বামীটির মনে সন্দেহ জাগে। যন্ত্রের বাজনাটা খানিকটা সময় ধরে বাজল যখন, তবে ধরে নেওয়া যায় এ নিছক কারো শয়তানি নয়। মিসকল নয়। কেননা মিসকল যারা দেয় তারা দু'এক সেকেন্ডের বেশি রিং ক'রে না। তবে কি তাদের দুজনের মধ্যে কারোকে ফোনই করছিল কেউ? কিন্তু তাহলে সে হ্যালো বলার সাথে সাথে ওপ্রান্তের ব্যক্তি ফোন নামিয়ে রাখল কেন? তবে কি যে ফোন করছিল সে পুরুষকণ্ঠ শুনেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল? সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি কি তবে প্রকৃপক্ষে তার স্ত্রীইে চাইছিল ফোনে? স্বামীটির মনে সন্দেহ ঘনায়।

ফোনোর ওপাশ থেকে সে নারী বা পুরুষ কোনো কণ্ঠই শোনেনি। শুধু শুনেছিল ফোন রেখে দেওয়ার আওয়াজটুকু। কিন্তু তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় ফোনের ওপ্রান্তে ছিল তার স্ত্রীর কোনো গোপন প্রেমিক, তার স্ত্রীকেই ফোন করছিল লোকটা। কিন্তু ফোনে পুরুষের গলা শুনেই লাইন কেটে দিয়েছে সেই লোক। রিসিভার রেখে দেওয়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল না! ভারীমতো নিঃশ্বাস। নিঃশ্বাসের শব্দে তো ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে তফাৎ করা যায় নাকি! মনে মনে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই স্বামীটি আড়চোখে তাকায় তার স্ত্রীর মুখের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ ক'রে নিতে চায় অভিব্যক্তির ওঠানামা। কোনোরকম অচেনা ছায়াপাত হচ্ছে কিনা সেখানে। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ে না তার। নিশ্চিন্ত হয় সে যে তার বৌ একটি গভীর জলের মাছ। হতেই হবে। স্ত্রীর অতীতের কথা মনে পড়ে যায় তার। যে মেয়েটি একদিন তার সঙ্গে পালিয়ে আসতে পেরেছিল নিজের ঘর, বাবা-মা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে, সে যে ভবিষ্যতে আর একবারও ঘর ছাড়তে দ্বিদা করবে না তাতে আর সন্দেহ কী! এই জাতের মেয়েগুলো এই ধরনেরই হয়। মনে মনে স্বামীটি যেমন বলে, 'বড্ড অসময়ে বাড়িতে থেকে তোমার প্রেমালাপে বাধা দিলাম, তাই না! কিন্তু সরি, তুমি চল ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায়, রঞ্জিত নস্করকে চিনতে তোমার এখনও অনেক দেকি আছে ডার্লিং...

মোটামুটি এইটুকু মাথার মধ্যে ছকে ফেলে তিথি। সত্যি প্লটটা দারুণ হয়েছে। ছোটগল্প ব্যাপারটা বরাবরই সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিথির এক অন্যতম প্রিয় মাধ্যম। একটা কথা তার অনেকবারই মনে হয়েছে যে একখানা ছোটগল্পের ঘটমান আকস্মিতার ভেতর দিয়ে জীবনের অনুষঙ্গ যতখানি সার্তকভাবে ধরা দেয় অথবা আজকের আধুনিক মনস্ক পাঠককে একটা ছোটগল্পের মাধ্যমে যতখানি প্রভাবিত করা সম্ভব সাহিত্যের আর কোনো শাখার সাহায্যে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস অনেকখানি দীর্ঘ প্রলম্বিত ব্যাপার স্যাপার বিস্তীর্ণ যার পটভূমি। আজকের দিনে পাঠকের হাতে আর অত সময় নেই বসে বসে বিমল মিত্রের একখানা 'বেগম মেরী বিশ্বাস' পড়ার। প্রবন্ধ জিনিসটাই আগাগোড়া জ্ঞানগর্ভ বিদগ্ধ কাটাছেঁড়ায় ভর্তি —ও কেবল একটা বিশেষ শ্রেণির জন্যই লেখা। আর আধুনিক কবিতা অ্যাপ্রোচ বলো কাঠামো বলো হাতে। গোনা খুব অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বড্ডই বেশি বেশি আইডিয়াল। একধারে আইডিয়োলজি আবার সাধারণ জীবনের বাস্তবতাকে বোধহয় শুধু ছোটগল্পই মেলাতে পারে আজকের দিনে।

আর তাই একটা সার্থক ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে জীবনের কত রকমারি দৃষ্টিকোণ থেকে যে একখানা বিশেষ আইডিয়োলজির প্রকাশ ঘটতে পারে প্লটটুকু চিন্তায় ধরা দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটা অবধিও কল্পনা করা যায় না। এই যেমন আজ তিথি একটা নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে ফেমিনিজমকে ধরতে পেরেছে। মনে মনে খুশি হয় সে। আর ওবেলার ফোনটা চেনা বা অচেনা জানতেও পারল না নিয়তির কেমন অদ্ভুত কারসাজিতে অজান্তেই হয়তো সে বাংলা নারীবাদী কথাসাহিত্যকে কী আশ্চর্য এক ভাবী যুগসন্ধিক্ষণের মুখে ঠেলে দিয়ে গেল।

এধরনের গল্প আগে লেখেনি তিথি। তার আগেকার প্লটগুলো ছিল বড় কর্কশ একপেশে। অনেকে বলে বড্ডই বেশিমাত্রায় ভাবসর্বস্ব যুক্তিবোধহীন বোকা বোকা আবেগপ্রবণ স্বপনদারা তো আড়ালে বলাবলি ক'রে তার দু'একখানা স্ক্রু ঢিলে আছে। 'আসলে নিজে ডিভোর্সি মহিলা তো, তাই...'কথাটা কানে এসেছে তিথির। সোজাসুজি চেপে ধরতে প্রবৃত্তি হয়নি ভেবেছে একদিন ওর কলমই এসব কথার জবাব দেবে। বুদ্ধির সূক্ষ্ম মোচড় নাকি নেই তার লেখায়। বেছে বেছে খালি পুরুষকে ঘাড় ধরে ভিলেন বানানো। চড়া দাগের হিন্দি সিনেমার মতো নাই। অথচ বলতে নেই আজকের নারীবাদী বাংলা কথাসাহিত্যে তিথির একটা নিজস্ব জায়গা, নিজস্ব আইডেনটিটি আছে। কবিতায় মল্লিকাদির যে প্লেসটা রয়েছে কথাসাহিত্যে তিথিরও সেটা তৈরি হচ্ছে ক্রমশ।

যাহোক তিথি মনে মনে নিশ্চিন্ত হয় এবারে আর কেউ তেমন অভিযোগ করতে পারবে না তার সম্পর্কে। কেননা এবারের গল্পটায় পুরুষ চরিত্রটির মনোবিশ্লেষণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। সেই সুযোগে পুরুষটির ভাবনার ভেতর দিয়েই সে দেখিয়ে দেবে পুরুষের চিন্তাধারা কতদূর নোংরা সংকীর্ণ আর সন্দেহপ্রবণ। এবারের গল্পে নারী সাইলেন্ট। সে কিছুই বলবে না কিছুই করবে না। ফেমিনিজমের বুলি আওড়াবে না। কাহিনির ক্লাইম্যাক্সে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নিদর্শন রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না। পুরুষ ঠিক যেমনটি চায় তেমনি কলাবৌটি সেজে লাথি ঝাঁটা খেয়েও মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। পুরুষটিই নিজের স্যাডিস্টিক মনোবৃত্তির বশে নারীটিকে ঘাড় ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে। নিজের মানসিক হীনতাকে প্রকাশ ক'রে ফেলবে। ওহ্, অনেকটা অন্য ধাঁচের গল্প। এমনটা আগে লেখেনি তিথি।

তিথি মনে ক'রে প্লট হল গল্পের কঙ্কাল। প্লটটাকে বাস্তবের উপযোগী ক'রে দাঁড় করানোর জন্য দরকার ঘটনার। এই ঘটনা হল গল্পে মাংস। প্লট অনুযায়ী ঘটনাকে সাজিয়ে তুলতে হয়। আর ঘটনার সেই অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য বিষয় গল্পও

অ্যানিমিয়ায় ভুগবে। চরিত্রদের কেন্দ্র ক'রেই তো ঘটনা এগিয়ে চলে। আর চরিত্রগুলোর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব-লেখককে সুনিপুণ হাতে যার উন্মোচন ঘটাতে হয়— সেইটিই হল গল্পের প্রাণ, কাহিনির মূলসত্তা।

এভাবে ভাবতে গিয়ে আজ হঠাৎ তিথির নিজেরই মনে হল তার আগেকার লেখাগুলো সেই অর্থে প্রাণহীন। ফেমিনিজমকে বাড়াবাড়ি মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাহিনির চরিত্রগুলোর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে ঠিকঠাক পরিস্ফুটনের সুযোগই সে হাতছাড়া ক'রে ফেলেছে। যেমন এখন মনে হচ্ছে খেলাঘর' -এ বিমলেন্দুরও কিছু বলার থাকতেই পারত শেষে। কিন্তু তাকে কোনোরকম অনুযোগ প্রকাশের সুযোগই দেয়নি তিথি। তাছাড়া ফেমিনিজমের পয়েন্টঅফ ভিউ থেকে ও বিচার ক'রে দেখতে গেলে বিমলেন্দুকে কাউন্টার ক্রস ক'রে যদি নীলিমা তার বক্তব্যকে শেষ অবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারত গল্পটার অ্যাপিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি জোরালো হত। অবশ্য ওই গল্পটার বেলায় তিথির নিজেরও তখন কিছু করার ছিল না। আড়াই হাজার শব্দের ভেতর লিখতে হল। বিমলেন্দুকে আর কিছু বলতে দিলে শব্দের বেঁধে দেওয়া কোটা পেরিয়ে যেত। তাই তিথিকে খানিকটা বাধ্য হয়েই বিমলেন্দুকে একপ্রকার থামিয়ে দিয়ে গল্পটা শেষ করতে হয়েছিল।

না, তার সমালোচকদের ক্রিটিসিজমের মধ্যে খানিকটা যুক্তি আছে বটে মানতেই হয়। অবশ্য স্বপনদার মতো পাবলিকদের কথা আলাদা। তবে ওইসব পার্সোনাল অ্যাটাকগুলোকে বাদ দিয়ে তিথির এখন যেটা মনে হচ্ছে— তার লেখায় ছোটগল্পেব সত্তার তুলনায় তত্ত্বই যেন বড় হয়ে উঠেছে। লেখাগুলো যেমন সব ছোটগল্পের আঙ্গিকে ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শেষদিকে আচমকা প্রবন্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ হাসি পায় তিথির। তাও বাঁচোয়া এই কথাগুলো অফ দ্য রেকর্ড ভাবছে সে। কেউ জানতে পারছে না। নিজের মুখে কোনো ইন্টারভ্যুতে স্বীকার করলে এতক্ষণে আর দেখতে হত না। খ্যাঁক ক'রে চেপে ধরার জন্য এমনি হাজারখানা লোক জুটে যেত। কাগজে তার কথাকে যতভাবে পারা যায় বিকৃত ক'রে কী না কী লেখা হত। এতদিনে একজন অন্তত নারীবাদী লেখিকার ভুল ভেঙেছে। তারপর তার একটা সামান্য কথাকে কাটাছেঁড়া ক'রে এরা হয়তো পঞ্চাশ বছর ভাঙিয়ে খেত। এরা বোঝে না যে নিজের এই মানসিক ভাঙচুর অন্তর্দ্বন্দ্ব আসলে ভুল ভাঙা নয়। আত্মানুসন্ধান আত্মজিজ্ঞাসা তার থেকে নিজেই নিজের অভ্যস্ত ছক ভেঙেচুরে ফেলে প্রতিনিয়ত নিজেকে এইভাবে যাচাই করা এ আসলে খাঁটি সাহিত্যিক মাত্রেই সম্পদ। যে সাহিত্যিক নিজেকে ভেতর থেকে ভাঙতে পারে না সে ক্রমে একটা জায়গায়ই আটকে যায়, দিন দিন তাৎপর্য হারায়। নিজেকে ভাঙতে পারাটা সাহিত্যিকের কাছে ভুলের স্বীকারোক্তি নয় বরং নিজের আইডিয়োলজিটাকেই আরো পরিণত ক'রে তোলা।

তবুও যদি অতীতের কোনো অবচেতন ত্রুটি, থেকেও থাকে তবে এই গল্পের নিজেকে শুধরে নেবে, ছাপিয়ে যাবে তিথি। একটা তাত্ত্বিক মতাদর্শ যাতে তার বিশ্বাস আছে তাকে শেষ অবধি ফুটিয়ে তুলবে সে ঠিকই, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পুরুষ যরিত্রটির মনোবিশ্লেষণই থাকবে স্বমহিমায়।

একজন পুরুষের ভাবনা। তিথি ভাবতে থাকে একজন পুরুষের চিন্তাধারা কেমন হতে পারে। একজন পুরুষের মনের ভেতর প্রবেশ করে তাকে লিখতে হবে।

তিথি ভাবতে থাকে। ফোনটা নামিয়ে রাখা ঠিক পরমুহূর্ত থেকে পুরুষটির চিন্তাধারা ঠিক কোন্ পথে এগোতে পারে। একবার মনে হল ফোনটা কেটে যেতেই স্বামীটির মনে খটকা লাগল এমনটা দেখালে কেমন হয়! সেই খটকা থেকেই তার মনে জাগল সন্দেহ।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি জন্মিয়ে দেওয়াটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। একটা ফোন বেজে উঠল স্বামীটি ধরতেই কেটে গেল। আর তাতেই তার মনে হল এ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর প্রেমিকের ফোন! এত অল্পে কি মানুষের মনে এতখানি সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে? তিথি ভেবে পায় না ঠিক। পুরুষের মন কি এতটাই সন্দেহপ্রবণ হয়? নিজের মনে মনেই প্রশ্নটা করে সে। এটা তিথির লেখালিখির একটা নিজস্ব স্টাইল। লিখতে লিখতে বা ভাবতে ভাবতে কোথাও আটকে গেলে অথবা ঠিক বেঠিক বিষয়ে মনে সংশয় দেখা দিলে তিথি নিজের মনকে প্রশ্ন করে। নিজের অভিজ্ঞতা নিজের শিক্ষাদীক্ষা নিজের রুচিবোধের কাছ থেকে উত্তর পেতে চায়। এইভাবেই একটা সময় নিজের ভেতর উপলব্ধি জন্ম নেয়।

কিন্তু আজ হঠাৎ তিথির মনে হয় তার বর্তমান প্রশ্নটির কোনো উত্তর নেই তার মনের কাছে। সে ঠিক জানে না একজন পুরুষের চিন্তাধারা কেমন হতে পারে। কেমন ক'রে তারা ভাবে, কেমন করেই বা ভালোবাসার নারীটিকে সন্দেহ করে। কভীবেই বা সেই সন্দেহ জন্ম নেয় তাদের মনে। তিথি একটু অবাক হয়, এতদিন নিজের এত লেখালিখিতে যাদের শয়তান শ্বার্থপর হিসেবে দেখিয়ে এসেছে সে, আজ হঠাৎ তাদেরই একজনের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিথি আটকে যায়। তার মনে হয় সে যেন ঠিকমতো জানে না ওই এক্স ওয়াই ক্রোমোজোমের জাতকটাকে। বোধহয় আজ অবধি উপলব্ধি করতে পারেনি কেমন করে ওরা চিন্তা করে। আর হয়তো তাই ওদের একজনের চিন্তাধারার ভেতর ঢুকতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। এতদিন তো এভাবে ওদের কারোর মনে ভেতর প্রবেশ করার দরকার পড়েনি ওর।

অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে আটকে যায় তিথি। একবার মনে হয় আগেকার গল্পগুলোর মতোই স্বামীটিকে গোড়াতেই সন্দেহপ্রবণ দেখিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত ক'রে ওঠে। এ গল্পটাকে একটু অন্য ধাঁচে লেখার ইচ্ছে তার। এত তাড়াতাড়ি সে স্বামীটির মনে সন্দেহের বীজ বুনে দেবে না। বরঞ্চ সন্দেহটা আসবে গল্পের সমাপ্তিতে। একজন সন্দেহপ্রবণ স্বামীর কাহিনি নয়, বরং পাকেচক্রে একজন পুরুষের সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তটাকেই ধরতে চায় তিথি। গল্পের সমস্তটা জুড়ে ভূত ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে শেষে স্বামীটির মনে সন্দেহ জাগবে। একটা উড়োফোন কেমন ক'রে একটা সাজানো সংসারে ধীরে ধীরে অশান্তির উড়োমেঘ বয়ে আনল সেটাই দেখাবে তিথি। দরকার হলে দু'একটা ফ্লাশব্যাক দেবে সে।

তিথির খেয়াল হয় ধীরে ধীরে নারীবাদ থেকে সে সাংসারিক চরিত্রগুলোর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে ঢুকে পড়ছে। তার গল্পের স্বামীটিকেও ঠিক এমনি ধাপে ধাপে মনোবিবর্তনের ভেতর দিয়ে সন্দেহের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।

একটা সামান্য উড়ো মিসকলকে কেন্দ্র ক'রে একজন পুরুষের চিন্তাভাবনা কত বিচিত্র পথে এগোতে পারে! কেমন অদ্ভুতভাবে সে নিজের মানসিক দৈন্যকে প্রকাশ ক'রে ফেলে। চরিত্রটার মনের মধ্যে মিশে গিয়ে নিবিষ্টভাবে চিন্তা করতে করতেই হঠাৎই একটা কথা মনে হল তিথির। তার কল্পিত পুরুষ চরিত্রটার মনের অন্ধকারে যে একখানা শয়তানের বিকৃতি লুকিয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যে একটা উড়ো মিসকলের কথা ভাবতে ভাবতে সে একসময় অন্যতর এক

অনুভূতিতে পৌঁছে যায়— অনেকটা যেন শিল্পীর গভীর পর্যবেক্ষণের ছোঁয়া রয়েছে না তার চিন্তায়! একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অনুভবের সূত্রপাত। শেষে সেই ঘটনা চলে যায় নেপথ্যে। বড় হয়ে ওঠে উপলব্ধি। তিথির মনে হল অসালে শয়তান এক বড় আর্টিস্ট। তাই যদি হবে শিল্পীর আবেগ কি তাহলে শয়তানের মনের মধ্যেও আছে?

তিথির হঠাৎ মনে পড়ে যায় একজন পুরুষকে। এক স্বার্থপর পুরুষ। কিন্তু প্রথম যেদিন তার সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছিল সেদিন তাকে একবিন্দুও স্বার্থপর মনে হয়নি তার। মনে হয়েছিল কত রোমান্টিক আবার কত ইনোসেন্ট! অথচ কীভাবে যেন ধীরে ধীরে বদলে গেল সেই প্রথম পরিচয়ের মানুষটা! নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তিথির। মনে হয় সেই প্রথম পরিচয়ের প্রদীপ আর শেষদিককার রিক্ত কর্কশ প্রদীপ যেন কী ক'রে আজ একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর চোখে। দুটো আলাদা আলাদা মানুষের ভেতরের যে অন্তর্লীন সাধারণ সত্তা তাকে যেন আজ সহসা একপলক দেখতে পেয়েছে তিথি।

এই প্রদীপ, তিথির মনে পড়ে, একদিন কত পাগল ছিল! প্রত্যেকদিন তিথির সাথে ফোনে অন্তত দশ মিনিট কথা না বলে থাকতে পারত না। আর সেখানে আজ বছর পাঁচেক হয়ে গেল কোনো যোগাযোগই নেই তা সাথে প্রদীপের। প্রদীপ কি আর কখনও তাকে ফোন করবে না! কেমন একটু আনমনা হয়ে যায় তিথি। আচ্ছা, এমন যদি হয়— হতেও তো পারে— ওবেলার সেই ফোনটা করছিল প্রদীপই। যদি তিথি ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলত এপাশ থেকে মনে মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হত প্রদীপের? সে কি প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলার সাহস দেখাতে পারত? না কি শুধু তিথির কণ্ঠস্বরটুকু শুনতে পেয়েই সে তৃপ্ত হত মনে মনে? রেখে দিত ফোনটা!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই তিথির একটানা চিন্তার জাল কেটে যায়। তার এই শোভাবাজারের ফ্ল্যাটের নম্বরটা জানার কথা নয় প্রদীপের। কথাটা মনে পড়তেই তিথির মনটা দমে যায় একটু। বেশ চিন্তা করছিল এতক্ষণ। প্রদীপ যেন একদিন তাকে ফোন করেছে। সেও রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল, প্রদীপ এবার কী করবে ভাবছে ওদিকে। ফোন নামিয়ে রাখবে নাকি সাহস ক'রে কথা বলবে?

বছর তিনেকের নাতিদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় প্রদীপকে তার যতটুকু চেনার সুযোগ হয়েছিল তার ভিত্তিতে অনুমান করার চেষ্টা করছিল তিথি। এমন পরিস্থিতিতে প্রদীপ ঠিক কী করতে পারত। তার মনে হচ্ছিল এই সুযোগে যেন সে নতুন ক'রে চিনছে প্রদীপকে। সেই সাথেই যেন তার গল্পের পুরুষটি বদলে যাচ্ছে। ভেঙেচুরে যাচ্ছে ভেতরে বাইরে। ধুলো ধুলো হয়ে যায় এতদিন ধরে তার সৃষ্ট সমস্ত পুরুষ চরিত্রেরা, বিমলেন্দু সুব্রত অভিষেক সৌমেন সব সব সবাই...

এ যাবৎ তিথি ভেবে এসেছে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ জাতটাকে তার চেনা হয়ে গেছে। সেইমতোই আজ সে মনে মনে ছকে নিয়েছিল পরবর্তী গল্পের প্লটকে। কিন্তু তার নিজেরই সেই ভাবী গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষটির মনের মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল তার। একইসাথে তিথির মনে হয় তারই সেই নতুন গল্পের কাহিনি যেন দুর্বার বেগে তার ভেবে রাখা পথ ছেড়ে এক অন্যতর গন্তব্যের পথে চলেছে। এই নতুন গল্প কি তারই সৃষ্টি? গল্পের সত্তা আজ গল্পকারের সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। তিথি ভেবে পায় না গল্পকার হিসেবে এ কি তার পরিণতি নাকি পরাজয়।

এখন তিথি স্নানঘরে। আবার শাওয়ারের সেই একটানা নিরুত্তাপ স্খলনের অনুরণনটুকু। কিন্তু তিথির এই একখণ্ড বিচ্ছিন্ন পৃথিবীটুকু আর শূন্য নিথর নয়। হাজার হাজার ডেসিবেলের কোলাহলদের অহরহ ঘোরাফেরা। বন্ধ দরজার একপাশের নিভৃত জগৎটায়।